রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাদম্বরী ------ ঘটনার অন্তরালে

মানুষের সাথে মানুষের অনেক ধরনের সম্পর্ক থাকে। নর ও নারীর সম্পর্ক ও তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। একটা সময় হয়তো ছিল নর - নারীর মধ্যে সামাজিক লেখা পড়ার বাইরে অন্য কোন ধরনের সম্পর্কের কথা ভাবাই যেতো না। সভ্যতার সাথে যুগে যুগে মানুষ তার সম্পর্কগুলোকে আলাদা নাম দিতে ও ব্যাখা করতে শিখেছে। তারপরও একটা কথা থেকেই যায়। সব সম্পর্ককেই কি সব সময় ভাষায় ব্যাখা করা যায়? নাকি সব ভালোলাগাকেই চিরাচরিত নাম ভালোবাসা বা প্রেমের আবরনে মুড়িয়ে দেয়া যায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা হলে অনেক সময়ই অনেকে তার বৌদি কাদম্বরী দেবীকে তার সাথে জড়িয়ে এক ধরনের রসাত্মক আলোচনা করতে পছন্দ করেন। তাদের মধ্যে একটা অন্য ধরনের সম্পর্কের ইঙ্গিতও দেন। আসলেই কি সেই ধরনের কিছু আদৌতেও তাদের মধ্যে ছিল? ভালোলাগা মানেই কি কোন ধরনের আলাদা বা নিষিদ্ধ সম্পর্ক?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের পরিবার একেতো ব্রাক্ষ ছিলেন তারমধ্যে আবার পিরালী। তাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক করতে সামাজিকভাবে অনেকেই সাহস পেতেন না। সেজন্য বাংলাদেশের যশোরের দিকে, যেখানে ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ছিল, তার আশে পাশের গ্রামের সাধারন ঘরের মেয়েদের দেখে বউ বানিয়ে আনা হতো। কিন্তু কাদম্বরী যশোরের সেরকম রায় বংশের মেয়ে ছিলেন না। তিনি ছিলেন কোলকাতার মেয়ে। যদিও তাদের আগে থেকেই ঠাকুর বাড়ির সাথে বিয়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। শুধু জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ি নয়, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ির সাথেও তাদের আত্মীয়তা ছিল বিয়ের সূত্র ধরে। তারপরও কাদম্বরীর সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর বিয়েতে জ্যোতি এর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজী ছিলেন না। কাদম্বরীর দাদা একসময় কাদম্বরীর বাবা ও কাকাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন। কাদম্বরীর দাদা তাদের বাড়ীর সন্দেশ খেয়ে বলে দিতেন কোনটি বাসি আর কোনটি নয়, সে সন্দেশ পরীক্ষকের নাতনী হবে তার আদরের ভাই জ্যোতির বউ? জ্যোতি তখন বিলেত যাবেন পড়তে। ফিরে এসে এই ছোট্ট খুকীর সাথে মানিয়ে নিতে পারবেনতো? শেষে না দুটি জীবন নষ্ট হয়ে যায় এই ভাবনায় তিনি কাতর ছিলেন। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি কিছুতেই গুরুজনদের মত পরিবর্তন করতে পারলেন না।

আট বছরের খুকী মাতঙ্গিনীর সাথে জ্যোতির বিয়ে হয়ে গেলো। ঠাকুরবাড়ীতে বহু বউদেরই আগের নাম বদলে দেয়া হতো। মাতঙ্গিনী হারিয়ে গেলেন কাদম্বরীর মধ্যে। যখন কাদম্বরী বউ হয়ে ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করেন, ঠাকুরবাড়ীর সে বছরের হিসেবের খাতায় লেখা আছে তার জন্য সে বছর বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ কেনা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছুটা গোড়া থাকলেও পরে দাদা সত্যেন্দ্র ও বৌদি জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাবে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করে কাদম্বরীকে ঘোড়ায় চড়া ও শিখিয়ে ছিলেন। গঙ্গার ধারে নির্জন শিক্ষা শেষ হলে প্রতিদিন তারা দুজন গড়ের মাঠে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে বের হতেন। সেই সময় কাদম্বরীর অশ্বারোহন রীতিমতো আলোড়ন জাগিয়ে ছিল কোলকাতার সমাজে। সাধারন নারীদের চোখে তিনি একে দিয়েছিলেন দুঃসাহসের মায়াঞ্জন। তিনি পশ্চিমিধারায় চলা মেয়ে নন, রীতিমতো সুপুরী কাটতেন, প্রতিদিন তরকারী কাটার আসরে তিনি উপস্থিত থাকতেন, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে দেখাশোনা করতেন। কারো জ্বর হলো শিয়রে কাদম্বরী, কারো অন্য সমস্যা ছুটলেন কাদম্বরী। গৃহস্থালী কাজের প্রতি কাদম্বরীর প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। সদ্য মাতৃহারা দেবর বালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও তিনি পরম স্নেহে সেসময় তার কাছে টেনে নেন, অথচ কতোই বা বয়স কাদম্বরীর তখন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে তিনি মাত্র এক বছরেরইতো বড়।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের যা কিছু সুন্দর তার সব কিছুর সাথে জড়িয়ে আছেন কাদম্বরী। তিনি এ বাড়িতে এসে তিন তলার ছাদে গড়ে তুললেন “নন্দন কানন”। পিল্পের উপর বসানো হলো সারি সারি পাম গাছ, আশে পাশে চামেলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাপা। তার সাথে এলো নানা রকম পাখী। ঘর সাজানোর দিকে প্রথম থেকেই কাদম্বরীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। দেখতে দেখতে ঠাকুরবাড়ির চেহারা তিনি পালটে দিলেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে তিনি সবচেয়ে উচু তারে বেধে দিয়েছিলেন, যা থেকে রবীন্দ্রনাথ আর কখনো সরে আসতে পারেননি। মাত্র কয়েক বছরেই প্রায় অশিক্ষিত এই বালিকাটি ঠাকুর পরিবারের মতো বিখ্যাত পরিবারের সাহিত্যের প্রানকেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কিছুতেই অংশ গ্রহন করতেন না। অপরকে প্রেরণায় উজ্জীবিত করাই ছিল তার ব্রত। যেটাকে প্রচলিত অর্থে বলা হয় রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ, তা কাদম্বরীর পুরোমাত্রায়ই ছিল। হয়তো ঠাকুরবাড়ীতে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তা তরতর করে বেড়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিন্তু তার ভিতরে তিনি সেটা বহু আগে থেকেই লালন করতেন।

নইলে এ বাড়ির প্রানপুরুষকে জাগিয়ে দিতে তিনি যতোটা সফল হয়েছিলেন, অন্যকেউই তা পারেননি। কাদম্বরীকে নিয়ে এতো বেশী আলোচনার কারন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে কাদম্বরীর ভুমিকা অসামান্য। তার অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে গভীর ছাপ রেখে যায়, যা তার অসংখ্য গল্পে, কবিতা, গানে তিনি প্রকাশ করেছেন। যারা অনেক কিছু কল্পনা করতে ভালোবাসেন তাদেরকে সেসব কল্পনা করার রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন কবি নিজেই। তিনি নিজেও জানতেন সেকথা। যার জন্যে তিনি কৌতুক করে শেষ বয়সে লিখেছিলেন, "ভাগ্যিস নতুন বৌঠান মারা গিয়েছিলেন, তাই আজোও তাকে নিয়ে কবিতা লিখছি, বেচে থাকলে হয়তো বিষয় নিয়ে মামলা হতো" ।

(চলবে)

তানবীরা তালুকদার
০২.০৭.০৮